ইসলাম ও জাহেলিয়াত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২০

১২শ প্রকাশ

রজব	১৪২০
কার্তিক	১৪০৬
নভেম্বর	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

اسلام اور جاهليت-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAM-0-JAHILIYAT by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 7.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষকে যত বস্তুরই সংস্পর্শে আসতে হয় তার প্রত্যেকটির প্রকৃতির গুণাগুণ ও অবস্থা এবং এর সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই একটি সুস্পষ্ট মত নির্দিষ্ট করে নেয়া একান্তই আবশ্যক। পূর্বেই এমত নির্দিষ্ট না করে কোন একটি জিনিসকেও কোন কাজে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে মত মূলত ভুল কি নির্ভুল সে প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু মত যে একটি নির্দিষ্ট করে নিতে হয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ নির্ধারণের পূর্বে কোন্ বস্তুর সাথে কিরূপ ব্যবহার ও আচরণ করতে হবে, কার সাথে কিরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে—চূড়ান্তভাবে তার ফায়সালা করাও কিছুতেই সম্ভব নয়। একথা বুঝাবার জন্য বিশেষ কোন যুক্তির অবতারণা করার কোনই আবশ্যকতা নেই। কারণ ইহা প্রত্যেকেই রাত্র-দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতেই বুঝে নিতে পারে। কারো সাথে প্রথম সাক্ষাত হলে তার সম্পর্কে জেনে নিতে হয় যে, কে এই ব্যক্তি, কি এর সম্মান ও মর্যাদা ? কোন্ ধরনের গুণ ও যোগ্যতা এর মধ্যে রয়েছে এবং আমার সাথে তার কোন্ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর না জেনে তার সাথে যে কোন্ ধরনের ব্যবহার বা আচরণ অবলম্বন করতে হবে তা নির্ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা যদি একান্ত অসম্ভবই হয়ে পড়ে, তবুও বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ হতে যথাসম্ভব এসব প্রশ্নের অন্তত একটি আনুমানিক উত্তর অবশ্যই ঠিক করে নিতে হয়। অতপর তার সাথে যে ধরনেরই আচরণ করা হোক না কেন, তা পূর্ব নির্ধারিত এই মতের ভিত্তিতেই করতে হয়। মানুষ খাদ্য হিসেবে যেসব দ্রব্য গ্রহণ করে, তা মানুষের খাদ্য প্রয়োজন পূরণ করে—এই জ্ঞান বা ধারণার ফলেই তা সম্ভব হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যা পরিত্যাগ করে বা দূরে নিক্ষেপ করে, যা মানুষ নিজের কোন না কোন কাজে ব্যবহার করে, যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষ যত্ন নেয়, যেসব জিনিসের প্রতি সম্মান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে, যাকে মানুষ ভয় করে বা ভালবাসে, সেসব সম্পর্কেই—তাদের সত্তা ও গুণাগুণ এবং তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ব নির্ধারিত ধারণার ভিত্তিতেই উক্তরূপ আচরণ ও ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরন্তু বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে স্থিরীকৃতি এ ধারণা নির্ভুল হলে এর সাথে অবলম্বিত আচরণও নির্ভুল হবে এবং এই ধারণা ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হলে এর প্রতি মানুষের ব্যবহার তদনুরূপ হবে। এই ব্যবহারে তারা পরস্পরের

উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু স্বয়ং সেই ধারণাটির শুদ্ধাশুদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে? তা নির্ভর করে বস্তুটি সম্পর্কে মত নির্ধারণের পন্থার উপর। সেমত হয় নির্ভুল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়, নতুবা শুধু আন্দায-অনুমান, অমূলক ধারণা কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ উপায়ের উপর নির্ভর করে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি শিশু আগুন দেখতে পায় এবং নিছক বাহ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তাকে 'চমৎকার খেলনা' বলে মনে করে। আগুন সম্পর্কে এমত ঠিক করার ফলেই শিশু উহা ধরবার ও উঠিয়ে নেয়ার জন্য হস্ত প্রসারিত করে দেয়। অন্য এক ব্যক্তি সেই আগুন দেখে নিছক ধারণা-অনুমানের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে এমত পোষণ করতে শুরু করে যে, এর মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে অথবা এটা ঐশ্বরিক বাহ্যরূপ। এ মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করে যে, তার সাথে তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া এবং তার সম্মুখে মাথা নত করাই কর্তব্য। এক তৃতীয় ব্যক্তি আগুন দেখে তার প্রকৃত রূপ, তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণ, শক্তি ও ক্ষমতার অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং চিন্তা ও গবেষণার পর এমত নির্ধারণ করে যে, এটা উত্তাপ দানকারী পদার্থ, অতএব এটাকে একান্ত চাকরের ন্যায় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এ মতের উপর ভিত্তি করে আগুনকে সে খেলনা মনে করে না। উপাস্য দেবতা হিসেবেও একে গ্রহণ করে না বরং প্রয়োজন মত একে কখনো খাদ্য প্রস্তুত কার্যে কখনো কিছু ভস্ম করার কাজে ব্যবহার করে। একই আগুনের সাথে এরূপ বিভিন্ন প্রকার আচরণের মধ্যে শিশু ও অগ্নিপূজকের আচরণ নিতান্ত অজ্ঞতা ও অন্ধতামূলক, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আগুনকে খেলনা মনে করা সম্পর্কে শিশুর ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। অগ্নি উপাসকের মত আগুনের খোদা হওয়া বা তাতে খোদার আত্মপ্রকাশ করার বিশ্বাসও—কোন বৈজ্ঞানিক অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক নয়। বরং এরূপ ধারণা নিছক খোশখেয়াল, কল্পনা ও অমূলক আন্দায-অনুমানের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আগুনকে সেবা পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করা, এর সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা সন্দেহ নেই। কারণ আগুন সম্পর্কে এই যে, মত নির্ধারণ করা হয়েছে, ইহা জ্ঞান ও নির্ভুল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

মানব জীবনের মৌলিক সমস্যা

এ ভূমিকা হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করে নেয়ার পর খুটিনাটি ব্যাপার হতে মূলনীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। মানুষ এ পৃথিবীর উপর নিজেকে বর্তমান দেখতে পায়, এর একটি শরীর বা দেহও রয়েছে, তাতে অসংখ্য প্রকার শক্তি ক্ষমতা ও প্রতিভা নিহিত রয়েছে ; তার সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবীর এক বিশাল বিস্তৃত এলাকা বিদ্যমান, তাতে রয়েছে অসংখ্য প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ; মানুষের মধ্যে তা ব্যবহার করার এবং নিজের প্রয়োজনে তা হতে উপকৃত হওয়ার মত শক্তি পুরোপুরি বর্তমান রয়েছে। তার চতুর্দিকে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর ইত্যাদি। এ সবের সাথে মানুষের জীবন নানা দিক দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথমে নিজের সম্পর্কে অন্যান্য জন্তু, বস্তু ও দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কে এবং এদের সাথে তার নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন মত ঠিক না করে এদের প্রতি কোনরূপ আচরণ অবলম্বন করা মানুষের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে ? মানুষ কি, তার উপর কোনরূপ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—কি হয়নি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন—স্বেচ্ছাচারী না কারো অধীন—কারো অধীন হয়ে থাকলে সে কার অধীন, কার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে, এ পার্থিব জীবনের কোন পরিণতি আছে—কি নেই, থাকলে তা কি—প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর ঠিক না করে এবং এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে নিজের জীবনের জন্য কোন পথই মানুষ বেছে নিতে পারে না। মানুষের যে দেহ এবং দেহের মধ্যে যেসব শক্তি নিহিত রয়েছে, তা তার নিজের মালিকানা স্বত্ব, না অন্য কারো দান মাত্র ; সেগুলোর হিসেব গ্রহণকারী কেহ আছে—কি নেই, সেগুলোর ব্যয়-ব্যবহারের নীতি সে নিজে নির্ধারিত করবে—না অন্য কেউ তা করে দিবে, এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিক না করে সে তার নিজের শক্তি-প্রতিভাকে কোন কাজেই নিযুক্ত করতে পারে না। চারিদিকে যে বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রীর অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে, তার মালিক ও স্বত্বাধিকারী সে নিজে—না অন্য কেউ ; সেগুলোর উপর তার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সীমাবদ্ধ না অসীম, সীমাবদ্ধ হলে সে সীমা কে নির্ধারিত করেছে, এসব প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট না করে মানুষ তার চতুষ্পার্শে অবস্থিত বস্তু ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করার কোন নীতিই নির্ধারিত করতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষ কাকে বলে, মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য করার ভিত্তি কি ; বন্ধুত্ব, শত্রুতা, মতৈক্য ও অনৈক্য,

সহযোগিতা ও অসহযোগিতাই বা কিসের ভিত্তিতে করা হবে। এ বিষয়ে কোন মত স্থির করার পূর্বে মানুষ পরস্পরের সাথে কোনরূপ ব্যবহার আচরণের নীতি ঠিক করতে পারে না। পরন্তু এই বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ এবং এর ব্যবস্থা কোন্ ধরনের এবং এখানে মানুষের অবস্থান কোন্ স্তরে তা ঠিক না করে কোন মানুষই সমষ্টিগত এই দুনিয়ার সাথে কোনরূপ ব্যবহার করতে পারে না।

উপরোল্লিখিত ভূমিকার ভিত্তিতে একথা অকুণ্ঠভাবে বলা যেতে পারে যে, ঐসব সম্পর্কে একটা না একটা মত স্থির না করে এর কোন একটিকেও কোন কাজে ব্যবহার করা অসম্ভব, আর বস্তুতই এসব প্রশ্নের কোন না কোন উত্তর চেতনায় হোক কি অচেতনায়—পৃথিবীর মানুষের মনে বর্তমান থাকেই, এর উত্তর ঠিক করতে মানুষ একান্তভাবে বাধ্য। যেহেতু এ মত নির্ধারণের পূর্বে সে কোন কাজই করতে সমর্থ হয় না। অবশ্য প্রত্যেকের মনেই যে এসব প্রশ্নের দার্শনিক উত্তর বর্তমান থাকবে, প্রত্যেকটি মানুষকেই যে দার্শনিক যুক্তি দ্বারাই এদের উত্তর নির্ধারণ করতে হবে এবং এক একটি প্রশ্নের সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে এর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিতে হবে, এমন কোন কথা নয়। কারণ সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না অনেক লোকের মনে এসব প্রশ্ন আদৌ কোন নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে না ; স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঐসব বিষয়ে অনেক সময় একটু চিন্তাও হয়ত অনেকে করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষই ঐসব প্রশ্নের অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোটামুটিভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর নিশ্চয়ই স্থির করে নেয়। ফলে তার জীবনের যে নীতিই হোক না কেন তা যে ঐ মতেরই অনিবার্য পরিণতি তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

উপরোক্ত কথা ব্যষ্টি সম্পর্কে যতখানি সত্য, বিভিন্ন জাতি বা দল সম্পর্কেও তা অনুরূপভাবে সত্য ও প্রযোজ্য। এই প্রশ্নসমূহ মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এ সবের উত্তর ঠিক করার পূর্বে সমাজ ও সভ্যতার জন্য কোনরূপ বিধান এবং মানব সমষ্টির জন্য কোনরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। এসব প্রশ্নের যে উত্তর নির্ধারিত হবে সে অনুসারেই নৈতিক চরিত্র সম্পর্কেও একটি বিশেষ মত স্থিরকৃত হবে, এর স্বরূপ অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের বাস্তব রূপায়ণ হবে। এক কথায় ঐ প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সমগ্র সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এ ব্যাপারে কোনরূপ ব্যতিক্রম আদৌ সম্ভব নয়। ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি উভয় বিষয়েই এসব প্রশ্নের যে উত্তর হবে বাস্তবক্ষেত্রে তা-ই রূপায়িত হবে। এমন কি, এক ব্যক্তি বা একটি সমাজের

আচার-আচরণ এবং কাজ-কর্মের যাচাই ও পুঙক্ষানুপুঙক্ষ বিশ্লেষণ করে এর পশ্চাতে উক্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহের কোন্ উত্তর কার্যকরী রয়েছে—তা অতি সহজেই জানতে পারা যায়। কারণ, এসব প্রশ্নের উত্তর যে ধরনের হবে, ব্যক্তিগত বা দলগত আচরণ এর বিপরীত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। মৌলিক দাবী এবং বাস্তব আচরণের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই হতে পারে ; কিন্তু উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের যে উত্তর প্রকৃতপক্ষে মানব মনের গভীরতম পটে মুদ্রিত রয়েছে, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং বাস্তব আচরণের প্রকৃতিতে কোনরূপ পার্থক্য হতে পারে না।

এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। মানব জীবনের উক্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহ—মনের মধ্যে যার কোন উত্তর ঠিক না করে মানুষ এ দুনিয়ার কোন কাজে এক বিন্দু পদক্ষেপও করতে পারে না বলে প্রমাণিত হল—মূলত এ সবই অদৃশ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বপ্রকৃতির ললাটে এর কোন উত্তর এমনভাবে লিখিত হয়েনি যা প্রত্যেকটি মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে পদার্পণ করার সংগে সংগেই পাঠ করে নিজ যোগ্যতার বলে সঠিক উত্তর জেনে নিবে। অধিকন্তু প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর এমন সহজ ও সুস্পষ্ট নয় যে, প্রত্যেকটি মানুষই তা স্বতঃই জেনে নিবে। এ জন্যই উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর নির্দিষ্ট একটি উত্তর সকল মানুষ একত্রিত হয়েও গ্রহণ করতে পারেনি। এই উত্তর সম্পর্কে সকল সময়ই মানুষের মধ্যে বিরাট মতবৈষম্য বর্তমান রয়েছে। আর সত্য কথা এই যে, বিভিন্ন পন্থায়ই উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে চিরদিন চেষ্টা করেছে। বস্তুত উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণের কোন্ কোন্ পন্থা সম্ভব হতে পারে এবং আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সে জন্য কোন্ পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আর সেই বিভিন্ন পন্থায় কোন্ ধরনের উত্তর লাভ করা যায়, তা জেনে নেয়া একান্তই আবশ্যক।

উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণের একটি উপায় হচ্ছে নিজের বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা এবং তদলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ এবং এর সাথে অনুমান ধারণার যোগ করে একটি নীতি ঠিক করা। তৃতীয় পন্থা হচ্ছে পয়গাম্বর—আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ—প্রত্যক্ষভাবে নিগূঢ় সত্য জ্ঞানের ধারক হওয়ার দাবী করে উক্ত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়েছে তা গ্রহণ করা।

মানব জীবনের উল্লিখিত মৌলিক প্রশ্নসমূহের উত্তর নির্ধারণের জন্য দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এই তিনটি পন্থাই অবলম্বিত হয়েছে। আর সম্ভবত এই কাজের জন্য এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও বর্তমান নেই। এর মধ্যে

প্রত্যেকটি পন্থাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রত্যেকটির উত্তর হতে একটি বিশেষ আচরণ নীতি লাভ করা যায় ; একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। এদের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ মৌলিক বিশেষত্বের দিক দিয়ে অন্যান্য সকল উত্তর হতে উদ্ভূত আচরণ নীতিসমূহ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। এসব বিভিন্ন পন্থা হতে উক্ত প্রশ্নাবলীর কি কি উত্তর লাভ করা গিয়েছে এবং প্রত্যেকটি উত্তর হতে কোন্ ধরনের আচরণ নীতি লাভ হয়েছে, অতপর আমি তাই বিস্তারিতভাবে দেখাতে চেষ্টা করব।

খালেছ জাহেলিয়াত বা নিরেট অন্ধতা

নিছক বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষ যখন উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর লাভ করতে চেষ্টা করে এবং এই উপায়ে কোন মত নির্দিষ্ট করে নেয়, তখন এ চিন্তাপদ্ধতির অতি স্বাভাবিক পরিণতি ক্রমেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা এই যে, সৃষ্টিজগতের এই বিরাট ও বিস্ময়কর ব্যবস্থা নিছক একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পশ্চাতে কোন সদিচ্ছা বা মহৎ উদ্দেশ্য বর্তমান নেই, ইহা স্বতস্ফূর্তভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নিজস্ব শক্তির সাহায্যে এর কার্যক্রম চলছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজে নিজেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিরাট বিশ্ব প্রকৃতির কোন স্বত্বাধিকারী কোথাও বর্তমান নেই। আর তা থাকলেও মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষকে এক প্রকার 'জন্তু' বলেই মনে করা হয় এবং সম্ভবত এক দুর্ঘটনার ফলেই এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। তাকে কেউ সৃষ্টি করেছে, না নিজেই তার সত্তা লাভ করেছে, তা সকলেরই অজ্ঞাত। আর মূলত এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মানুষকে এই পৃথিবীতে জীবন্ত ও বিচরণশীল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে নানাবিধ ইচ্ছা, বাসনা ও লালসা রয়েছে, তার প্রকৃতি নিহিত শক্তি এর চরিতার্থ করার জন্য অহর্নিশ প্রবলভাবে উত্তেজনা দেয়। তার অংগ-প্রত্যংগ, অস্ত্র-সরঞ্জাম রয়েছে ; সে সবের সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত লালসা-বাসনা চরিতার্থ করা যেতে পারে। মানুষের চতুষ্পার্শের এই বিশাল বিস্তৃত ভূমির বুকে সীমা-সংখ্যাহীন উপাদান-উকরণ বিদ্যমান রয়েছে, এ সবের উপর মানুষ নিজের অংগ-প্রত্যংগ ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ করে নিজের বাসনা পূর্ণ করতে পারে ঃ

অতএব তার অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে নিজস্ব লালসা-বাসনা পূর্ণরূপে চরিতার্থ করা ভিন্ন এর ব্যবহার ক্ষেত্র আর কিছু নেই এবং সমগ্র দুনিয়া অফুরন্ত দ্রব্য-সামগ্রীর একটি ভান্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ তার উপর হস্ত প্রসারিত করবে এবং নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করবে—পৃথিবীর এটাই একমাত্র কাজ। এর উপর এমন কোন শক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশীল সত্তা নেই, যার নিকট মানুষ জবাবদিহি করতে বাধ্য হতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য আইন-বিধান লাভ হতে পারে—সত্যজ্ঞান ও পথনির্দেশ লাভের এমন কোন উৎস কোথাও নেই। ফলত মানুষ স্বাধীন, দায়িত্বহীন ও স্বাধিকার সমন্বিত এক সত্তা। নিজের জন্য

প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনা, তার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের ব্যবহার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীতে বর্তমান সকল প্রকার জীব-জন্তু ও বস্তুর সাথে নিজের সম্পর্ক ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা তাদের নিজেদেরই কাজ। এ ব্যাপারে কোনরূপ পথনির্দেশ লাভ করতে হলে জন্তু-জানোয়ারের জীবনে, প্রস্তর-পর্বতের ইতিকাহিনীতে এবং স্বয়ং মানুষেরই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান সম্ভারের উপর নির্ভর করতে হবে। মানুষ কারো নিকট দায়ী নয়, কারো নিকট তাকে যদি একান্তই জবাবদিহি করতে হয় তবে তা তার নিজের নিকট ; অথবা জনগণের মধ্য হতে উদ্ভূত ও সমাজের ব্যক্তিদের উপর প্রভাবশীল রাষ্ট্রশক্তির নিকটই তাকে জবাবদিহি করতে হবে অন্য কারো নিকট নয়। পরন্তু মানুষের ইহকালীন জীবনই একমাত্র ও চূড়ান্ত জীবন, সকল প্রকার কাজের প্রতিফল এই জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সমাপ্তব্য। কাজেই কেবল এ দুনিয়াতে প্রকাশিত কর্মফলের ভিত্তিতেই কোন নীতির শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-নির্ভুল, উপকারী-ক্ষতিকর, গ্রহণযোগ্য-বর্জনীয় ইত্যাদি সবকিছুই নির্ধারিত করতে হবে।

বস্তুত এটা একটি পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন, এতে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মানব জীবনের সকল প্রকার মৌলিক প্রশ্নের জবাব দান—সকল প্রকার সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। এই জবাবের প্রত্যেকটি অংশই অন্যান্য অংশের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, একটির সাথে অন্যটির স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ জন্যই এ জীবন দর্শন গ্রহণকারী মানুষ দুনিয়াতে সংগতি ও সামঞ্জস্য পূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে। এই উত্তর এবং তদোদ্ভূত আচরণ ও জীবনধারা মূলত শুদ্ধ না ত্রুটিপূর্ণ সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নসমূহের উক্ত জবাবের ভিত্তিতে মানুষ এই দুনিয়ার বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে যে নীতি ও ভূমিকা গ্রহণ করে, অতপর তাই আলোচনা করে দেখতে হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে উক্তরূপ দৃষ্টিভংগী ও জীবন দর্শন গ্রহণ করার ফলে মানুষ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করে সে নিজেকে নিজের, নিজ দেহ ও দৈহিক শক্তিসমূহের একচ্ছত্র মালিক মনে করতে শুরু করে, নিজের ইচ্ছামতই এর প্রয়োগ ও ব্যবহার করে। পৃথিবীর যে বস্তুই তার করায়ত্ব হবে, যে লোকদের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে, এই বস্তুবাদী ব্যক্তি তার সাথে তার মালিক হিসেবেই ব্যবহার করবে।

নিছক প্রাকৃতিক নিয়মে ও সমাজ জীবনের সংঘবদ্ধ জীবনধারা ভিন্ন আর কোন শক্তিই তার ক্ষমতা ও স্বাধীন অধিকারকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন বা সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তার নিজের হৃদয়-মনে কোন নৈতিক অনুভূতি–দায়িত্বজ্ঞান ও জবাবদিহি করার ভয় হবে না, যা তার বল্গাহারা জীবনধারা কিছুমাত্র ব্যাহত করতে পারে। যেখানে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা কিছুই নেই, কিংবা তা থাকা সত্ত্বেও একে উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছামত কাজ করা সম্ভব। সেখানে এই মত ও জীবন দর্শনের অনিবার্য ফলে সে অত্যাচারী-বিশ্বাসঘাতক, দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্প্রবৃত্তিশীল জন্মপাপী ও ধ্বংসকারী অবশ্যই হবে। স্বভাবতই সে হবে স্বার্থপর, জড়বাদী ও সুবিধাবাদী (Opportunist)। তার নিজের প্রবৃত্তির লালসা-বাসনা ও পাশবিক প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাওয়া ভিন্ন তার জন্ম ও জীবনের আর কোন লক্ষ্যই থাকে না। এবং যেসব জিনিস তার এই জীবন উদ্দেশ্যের আনুকূল্য করবে, কেবলমাত্র তাই তার দৃষ্টিতে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীত হবে। বস্তুত ব্যক্তিগতভাবে লোকদের মধ্যে এরূপ মনোভাব ও স্বভাব-প্রকৃতির উদ্ভব হওয়া আলোচ্য মতের স্বাভাবিক ফল, এ ধরনের লোক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কারণে সহানুভূতিশীল হতে পারে, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের ভাবধারা তার মধ্যে থাকতে পারে, তখন এক কথায় সমগ্র জীবনে একপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ নৈতিক অনুভূতির পরিচয় সে দিতে পারে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার বাস্তব কাজ-কর্ম ও আচরণের বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে, মূলত এটা তার স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতারই সম্প্রসারিত রূপ মাত্র। বস্তুত সে নিজে দেশের ও জাতির কল্যাণ এবং উন্নতিতে নিজেরই উন্নতি এবং কল্যাণ দেখতে পায়—আর এ জন্যই সে তার দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে। এ ধরনের মানুষ খুব বেশী কিছু হলে একজন জাতীয়তাবাদীই হতে পারে, অন্য কিছু নয়।

এতদ্ব্যতীত, এ ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সমন্বয়ে যে সমাজ গঠিত হবে তার বিভিন্ন দিকের অবস্থা নিম্নরূপ হবে ঃ এর রাজনীতি মানব-প্রভুত্বের উপর স্থাপিত হবে। তা এক ব্যক্তি কিংবা একটি পরিবারেরও হতে পারে অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর বা জনগণের প্রভুত্বও হতে পারে। আর সর্বাপেক্ষা উন্নত যে সংঘ কায়েম করা যেতে পারে, তা হবে রাষ্ট্র সংঘ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই আসল আইন প্রণয়নকারী হবে মানুষ। আর নিছক ইচ্ছা, লালসা, বাসনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল প্রকার আইন রচনা এবং এর রদবদল করা হবে। সুযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিতে সকল কাজের নীতি নির্ধারণ ও

পরিবর্তন করা হবে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধূর্ত, শঠ, শক্তিশালী, কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, পাষাণমনা এবং পাপিষ্ঠ আত্মার লোকই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করতে পারবে—এদের উপর অর্পিত হবে সমাজের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ও অধিকার। তাদের বিধান গ্রন্থে শক্তিরই নাম হবে সত্য, আর দুর্বল বাতিল বলে অভিহিত হবে।

এমতাবস্থায় সমাজ ও সভ্যতার সমগ্র ব্যবস্থায়ই আত্মপূজার ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। সকল প্রকার স্বাদ-আস্বাদন, নৈতিক বিধি-বন্ধন হতে মুক্ত হলে যেরূপ নৈতিক মানদন্ড স্থাপিত হবে এর ফলে উদগ্র লালসার চরিতার্থতায় খুব বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারবে না।

শিল্প-সাহিত্য ও অনুরূপ মানসিকতায় প্রভাবান্বিত হবে, নগ্নতা ও পাশবিকতার ভাবধারা উত্তরোত্তর তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে দেখা দিবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামন্তবাদ ও জায়গীরদারী প্রথার বিস্তার ঘটবে, কখনও পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্র এর স্থানে এসে দাঁড়াবে, আবার কখনো মজুর-শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের নিরংকুশ একনায়কত্ব (Dictatorship) কায়েম করবে। সেখানে কোন সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কারণ পৃথিবী এবং এর ধন-দৌলত সম্পর্কে এহেন সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী হবে এবং প্রত্যেকেরই ধারণা হবে যে, এই পৃথিবী একটি লুণ্ঠন ক্ষেত্র—সময় সুযোগ দেখে এবং ইচ্ছামত 'হাত সাপাই' করে যতদূর ইচ্ছা সম্পদ আত্মসাৎ করতে কোনরূপ বাধা নেই। এই সমাজে ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা চালু হবে, তার স্বভাব-প্রকৃতিও এই জীবন দর্শন এবং এই আচরণেরই অনুরূপ হবে। এই সমাজের প্রত্যেকটি নবোদ্ভূত বংশ ও অধস্তন পুরুষের মন-মগযে পৃথিবী, মানুষ এবং পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত রূপ-ধারণাই বদ্ধমূল করে দেয়া হবে। সকল প্রকার তথ্য ও জ্ঞানকে-জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখা সম্পর্কে হোক না কেন—এমনভাবে সজ্জিত ও গঠিত করা হবে যেন জীবন সম্পর্কে এই ধারণা স্বতঃই তাদের মন ও মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায়। উপরন্তু বর্তমান জীবনেই উক্তরূপ আচরণ গ্রহণ করা এবং অনুরূপ সমাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে স্থান লাভ করার উপযোগী করে তুলার জন্যই তাদেরকে তৈয়ার করা হবে। এরূপ শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় সম্পর্কে আপনাদের নিকট কিছু বলতে হবে বলে মনে করি না—এর বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্তমান সমাজ হতেই লাভ করা যায়। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদেশের লোকজন শিক্ষালাভ করছে, তা সবই এ মতাদর্শের ভিত্তিতেই স্থাপিত

হয়েছে, যদিও এর নাম রাখা হয়েছে 'ইসলামিয়া কলেজ' ও 'মুসলিম ইউনিভার্সিটি'।

বস্তুত যেরূপ আচরণের বিশ্লেষণ এখানে করা হল, এটা খালেছ 'জাহেলিয়াতের' আচরণ, এটা সেই শিশুর আচরণেরই অনুরূপ যে শুধু বাহ্যেন্দ্রীয়ের সাহায্যে স্থূল পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আগুনকে একটি সুন্দর খেলনা বলে মনে করতে থাকে। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, শিশুর পর্যবেক্ষণের ভুল সঙ্গে সঙ্গেই এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফতেই ধরা পড়ে যায়। কারণ, যে আগুনকে শিশু খেলনা মনে করে একে স্পর্শ করার আচরণ গ্রহণ করেছে, তা ভস্মকারী আগুন ; স্পর্শমাত্রই প্রমাণ করে দেয় যে, এটা খেলনা নয়—আগুন। পক্ষান্তরে সমাজ জীবনের এই পর্যবেক্ষণ নীতির ভ্রান্তি বহু বিলম্বেই প্রমাণিত হয়, অনেকের নিকট হয়তো সারা জীবনেও তা কখনো ধরা পড়ে না। কারণ, এরা যে 'আগুনে' হস্তক্ষেপ করে এর আঁচ ঈষদুষ্ণ, সহসাই এবং স্পর্শ মাত্রই এর তাপ দুঃসহভাবে অনুভূত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তা শতাব্দীকাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে থাকে। এতদসত্ত্বেও এ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার কারো ইচ্ছা হলে তারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে এ মতাদর্শের বদৌলতে জনগণের বেঈমানী, শাসকদের যুলুম-পীড়ন, বিচারকদের অবিচার, ধনীদের স্বার্থপরতা ও শোষণ এবং সাধারণ লোকদের অসচ্চরিত্রতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং এ মতাদর্শের ফলে জাতি পূজা, জাতি প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম দেশ জয় ও জাতি হত্যার যে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হয় তা প্রত্যক্ষ করে অতি সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এটা নিরেট অন্ধতা ও খালেছ জাহেলিয়াতেরই আচরণ, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত এটা কোন বৈজ্ঞানিক আচরণ নয়, বুদ্ধিভিত্তিক ও চিন্তামূলক আচরণও এটা নয়। কারণ নিজের এবং বিশ্বচরাচরের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা নির্দিষ্ট করে মানুষ উক্তরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে তা প্রকৃত অবস্থা ও সত্যিকার ঘটনার অনুরূপ নয়। তাহলে এর পরিণতি যে এরূপ খারাপ হতে পারত না, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

অতপর জ্ঞান লাভের অন্যান্য প্রচলিত পন্থারও যাচাই করে দেখা আবশ্যক। মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান, মৌলিক প্রশ্নের জবাব দান করার দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে নিছক ধারণা ও আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা এবং জীবনের উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত মত নির্দিষ্ট করা। এ পন্থা হতে তিনটি বিভিন্ন মত কায়েম করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মত হতেই একটি বিশেষ ধরনের আচরণ উদ্ভূত হয়েছে।

শির্ক

একটি মত হচ্ছে এই যে, বিশ্ব প্রকৃতির এই বিরাট ব্যবস্থা যদিও কোন 'রব' ব্যতীত চালু হওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু এর খোদা (ইলাহ ও রব) একজন মাত্র নয়, তারা অসংখ্য বহু। বিশ্বজগতের বিভিন্ন শক্তির গোড়ার সূত্র বিভিন্ন খোদার হাতে নিবদ্ধ ; মানুষের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, লাভ-লোকসান ইত্যাদি অসংখ্য ঐশ্বরিক সত্তার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এ মতাদর্শ অবলম্বনকারীগণ আন্দায-অনুমানের সাহায্যে উক্ত খোদাসূলভ শক্তিসমূহের উৎস ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছে। ফলে এই অনুসন্ধান ব্যাপদেশে যে যে শক্তির উপরই তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তাদেরকেই এরা 'খোদা' মনে করেছে। এ মত গ্রহণ করার পর মানবজীবনে যেরূপ আচরণ স্বতঃই কার্যকরী হয়, তার পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ঃ এর ফলে মানুষের সমগ্র জীবন অবাস্তব আন্দায-অনুমানের পাদপীঠে পর্যবসিত হয়। মানুষ তখন বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা ছাড়া নিছক আন্দায-অনুমানের সাহায্যে অসংখ্য বস্তুকে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে মনে করতে শুরু করে, তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায় মানুষের ভাগ্যের উপর ভাল কিংবা মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম বলে মনে করে। এ জন্য মানুষ—উক্ত মতের বিশ্বাসী ব্যক্তি ভাল প্রভাবের অবাস্তব আশায় এবং মন্দ প্রভাবের অবান্তর ভয়ে নিমজ্জিত হয়ে নিজের বিপুল শক্তি অর্থহীনভাবে অপচয় করে। কোথাও কোন সমাধির প্রতি আশা পোষণ করতে শুরু করে যে, এটা তার অসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করে দিবে ; কোথাও কোন দেবতার উপর ভরসা করা হয় এবং সে মানুষের ভাগ্য ভাল করে দিবে বলে আশা করা হয়। এরূপ কাল্পনিক উপাস্য ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকে খুশী করার জন্য এসব মানুষ চেষ্টা করে। কোথাও এতটুকু কু-লক্ষণ দেখতে পেলে এদের মন ভেঙ্গে পড়ে—হতাশায় কাতর হয়। আবার কোথাও ভাল লক্ষণের উপর আশা ভরসার কাল্পনিক প্রাসাদ রচনা করে বসে। এই জিনিসই তার মতবাদ-চিন্তাধারা এবং তার চেষ্টা-সাধনাকে স্বাভাবিক পন্থা হতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে এক সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয় ঃ এ মতের কারণেই পূজা পাঠ, মানত, উপহার, অর্ঘ্য এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ কর্মতালিকা রচিত হয়ে পড়ে। আর তাতে জড়িত হওয়ার কারণে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার একটি বিরাট অংশ অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যয়িত হয়।

তৃতীয় ঃ এই মুশরেকী কল্পনা-পূজার কুসংস্কারে তারা নিমজ্জিত হয়, ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তিগণ তাদেরকে নিজেদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠন করার বিরাট সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে কেউ রাজা বা বাদশাহ্ হয়ে বসে এবং সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার সাথে নিজের বংশের সম্পর্ক দেখিয়ে লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করে যে, তারাও অন্যতম খোদা ; আর তোমরা তাদের দাস। কেউ পুরোহিত সেজে বসে এবং বলে যে, যাদের হাতে তোমাদের লাভ-ক্ষতির মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তাদের সংগে আমাদের নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান ; কাজেই তোমরা আমাদের মাধ্যমে তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে পার। কেহ্ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও পীর হয়ে বসে, তাবীয-তুমার, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র এবং সাধনা বা 'হাসিলিয়াতের' জাল বিস্তার করে, আর লোকদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে চায় যে, আমাদের এসব জিনিস অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তোমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে—দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারে, ব্যথা-বেদনা প্রশমিত করতে পারে। এরপর এসব চতুর লোকের পরবর্তী বংশ একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন পরিবার বা শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফলে তাদের অধিকার, মর্যাদা-স্বাতন্ত্র এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কালের অগ্রগতির সংগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, সম্প্রসারিত ও গভীরতর ভিত্তিতে সুদৃঢ় হতে শুরু করে। এর দূরুন—এরূপ বিশ্বাস-মতবাদের দৌলতে—জনসাধারণের মাথার উপর রাজপরিবার, ধর্মীয় পদাধিকারী ও আধ্যাত্মিক নেতাদের খোদায়ী মযবুতভাবে স্থাপিত হয়। এবং কৃত্রিম খোদা লোকেদেরকে একান্ত দাসানুদাসে পরিণত করে—মনে হয় যেন এরা তাদের জন্য দুগ্ধ দান, ভারবহন ও যানবাহনের কাজ করার জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চতুর্থ ঃ এই মতাদর্শ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির জন্য কোন স্থায়ী ও স্বতন্ত্র ভিত্তি উপস্থিত করতে পারে না, অনুরূপভাবে এহেন কাল্পনিক 'খোদা'দের নিকট হতে মানুষ অনুসরণযোগ্য কোন প্রকার জীবন ব্যবস্থাও লাভ করতে পারে না। মানুষ এই কাল্পনিক 'খোদাদের' অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের আশায় পূজা-উপাসনা ও কয়েকটি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করতে থাকবে—এই খোদাদের সাথে সম্পর্ক এ পর্যন্তই সীমবদ্ধ হয়ে থাকবে। মানব জীবনের বৃহত্তর ও বিশালতর ক্ষেত্রে—জীবনের বাস্তব কাজ-কর্মের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন রচনা করা ও কর্মনীতি নির্ধারণ করা মানুষের নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধিকারমূলক কাজ হবে মাত্র। এভাবে 'মুশরিক'—শির্ক ভিত্তিক সমাজ—কার্যত নিরেট অন্ধতার—খালেছ জাহেলিয়াতের পূর্ববর্ণিত পথেই চলতে বাধ্য হয়। নৈতিক চরিত্র, বাস্তব কাজ-কর্ম, সামাজিক ধরন-পদ্ধতি, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য—সকল ক্ষেত্রেই শির্ক ভিত্তিক জীবন-দর্শন উদ্ভূত আচরণ খালেছ জাহেলিয়াতের আচরণেরই অনুরূপ, নীতিগতভাবে এদের মধ্যে কোনই পার্থক্য হয় না।

বৈরাগ্যবাদ

বাস্তব পর্যবেক্ষণের সাথে অমূলক আন্দায-অনুমান সংমিশ্রণের ফলে মানবজীবনের মৌলিক প্রশ্নের দ্বিতীয় যে উত্তরটি ঠিক করা হয়েছে, এক কথায় বলা যায় বৈরাগ্যবাদ। এ মতাদর্শের গোড়ার কথা এই যে, পৃথিবী এবং মানুষের শারীরিক সত্তা স্বয়ং মানুষের জন্য একটি 'শাস্তি কেন্দ্রবিশেষ' আর মানুষের আত্মাকে একটি দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, বস্তু জগতের সাথে একটি জড় সম্পর্ক বর্তমান থাকায় মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, ইচ্ছা-বাসনা এবং প্রয়োজনীয় যা কিছুই রয়েছে মূলত তা সবই বন্দীখানার শৃংখল বিশেষ। এই পৃথিবী এবং এর দ্রব্য সামগ্রীর সাথে মানুষ যতই সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, ততই তার এই শৃংখলের বন্ধন দৃঢ়তর হবে এবং সে ততোধিক কঠোর শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এই শাস্তি হতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ ও ধান্ধা-ঝামেলা পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে স্বাভাবিক লোভ-লালসা ও ইচ্ছা-বাসনাকে কঠোরভাবে অবদমিত করা, স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করা, শারীরিক প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তির দাবী ও প্রেরণাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা ; রক্ত-মাংসের বাস্তব সম্পর্কের কারণে হৃদয় মনে যে প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়, পূর্ণরূপে তার মূলচ্ছেদ করা এবং এই শত্রুকে—মন ও দেহকে কঠোর ও অন্তহীন ও কৃচ্ছ্রসাধনার সাহায্যে এমনভাবে নিষ্পেষিত করা যেন আত্মার উপর এর কোনরূপ প্রভাব-প্রভুত্ব আদৌ স্থাপিত হতে না পারে। এর ফলে আত্মা লঘু ও পবিত্র হবে এবং মুক্তির উচ্চতম মার্গে উড্ডীন হওয়ার শক্তি লাভ করতে পারবে।

এরূপ মতাদর্শের ফলে মানবজীবনে নিম্নলিখিত রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

প্রথমত, এর প্রভাবে মানুষের সমগ্র ঝোঁক-প্রবণতা সমষ্টিবাদ হতে ব্যষ্টিবাদের দিকে এবং সমাজ ও সভ্যতা হতে বর্বরতার দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ পৃথিবী এবং জীবনধারা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে পড়ে। কোন জৈবিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তার সমগ্র জীবন অসহযোগ ও সম্পর্কহীনতার বাস্তব প্রতিমূর্তিতেই পরিণত হয়। তার চরিত্র সম্পূর্ণ নেতিবাচক (Negative) ভাবধারায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, এই মতাদর্শের প্রবল প্রভাবে সমাজের উত্তম ও সৎলোকেরা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন একাকীত্বের নিভৃততম কোণে আশ্রয় নেয় এবং নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে। ফলত পৃথিবীর সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপূর্ণ কাজ-কর্মের চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এ মতের যে প্রভাব আবর্তিত হয়, তার ফলে লোকদের মধ্যে নেতিবাচক (Negative) নৈতিকতা, সমাজবিরোধী (Individualistic) ভাবধারা এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক মতবাদ সৃষ্টি হয়। তাদের কর্মশক্তি ও কার্যদক্ষতা ক্ষীণ হতেও ক্ষীণতর হয়ে যায়। অত্যাচারীদের জন্য তারা 'সহজভোগ্য' হয়ে পড়ে এবং সকল দুধর্ষ নিপীড়ক সরকার তাদেরকে অতি সহজেই হস্তগত করে নিতে পারে। বস্তুত এই মতাদর্শ জনগণকে যালেম লোকদের পক্ষে বিনয়াবনত ও পোষমানা (Tame) বানিয়ে দিতে যাদুর মত অব্যর্থ।

চতুর্থত, মানব প্রকৃতির সাথে এই বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের চিরস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রায়ই এটা সংগ্রামে পরাজিত হয়। এটা পরাজিত হলে নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য তারা নানা ফন্দি ও কূটকৌশলের সাহায্যে আত্মপ্রতারণা করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মে 'কাফ্ফারা' এশকে মাজাযী—দুনিয়া ত্যাগের আবরণে দুনিয়া পূজার এই যে পংকিল ও লজ্জাকর অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়েছে, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

সর্বেশ্বরবাদ

অবাস্তব আন্দায-অনুমানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে তৃতীয় যে মতটির সৃষ্টি হচ্ছে, তা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। অর্থাৎ মানুষ ও বিশ্বজগতের সমগ্র জিনিসই মূলত অপ্রকৃত। এদের আদৌ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বস্তুত একটি সত্তাই এ সমগ্র বস্তুজগতকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে মাত্র এবং তাই এ সকলের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান। বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে এ মতাদর্শের অসংখ্য রূপ প্রকাশিত হয়। সমগ্র সৃষ্টিজগত—বস্তুজগত একটি মাত্র সত্তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মূলত সেই সত্তাই বর্তমান, অন্যান্য যা কিছু পরিদৃষ্ট হয় আসলে তা কিছুই নয়—এই একটি মাত্র সত্তাই হচ্ছে এর সারকথা।

এ মতাদর্শের ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় সংশয়বাদ। তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তার মনে জেগে উঠে সন্দেহের নিরন্ধ্র তমিস্রা। ফলে তার দ্বারা বাস্তব দুনিয়ার কোন কাজই যে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সম্পন্ন হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সে নিজেকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত পুত্তলিকা মনে করতে শুরু করে, যাকে অন্য কেউ অন্তরালে থেকে নাচাচ্ছে, অথবা অন্য কেউ তার মধ্যে থেকে নৃত্য করছে। সে তার এই অমূলক কল্পনার গভীর পংকে আত্মনিয়োগ হয়ে পড়ে। তার নিজের জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই থাকতে পারে না, কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপথও নয়। সে মনে করে আমি নিজে তো কিছুই নই আমার করারও কিছু নেই। আর আমার করার কিছু থাকতেও পারে না। মূলত সে-ই সার্বিক সত্তা—যা আমার মধ্যে ও সমস্ত সৃষ্টিজগতের পরতে পরতে বিকাশমান—যা অজ্ঞাত আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত চলে আসছে, সকল কাজ তারই, সকল কর্ম সে-ই সম্পন্ন করে। সত্তা যদি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমিও পরিপূর্ণ, অতএব আমার চেষ্টা-সাধনা করার কোন প্রয়োজন নেই। আর সেই সত্তাই যদি নিজের পূর্ণতা বিধানের জন্য চেষ্টিত হয়ে থাকে, তাহলে যে বিশ্বব্যাপক গতি সহকারে সে নিজের পূর্ণতা লাভের দিকে অব্যাহতভাবে ছুটে চলেছে একটি অংশ হিসেবে এর দিকে আবর্তনে পড়ে আমিও সে দিকে পৌছতে পারব। আসলে আমি একটি অংশবিশেষ, সার্বিক সত্তা কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় যেতে চাচ্ছে, তা আমি কিছুই জানি না।

এরূপ চিন্তা পদ্ধতির বাস্তব ফল বৈরাগ্যবাদী জীবন দর্শনের অনুরূপই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এমত গ্রহণকারীদের কর্মনীতির সাথে খালেছ

জাহেলিয়াতের অনুসারীদের কর্মনীতির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ এদের সকলেই নিজেদের সমগ্র জীবনকে নিজেদের প্রবৃত্তি ও অন্ধ লালসার দাসানুদাসে পরিণত করে। ফলে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে দিকে নিয়ে যায়, তারা নির্বিচারে ও নির্বিকার চিত্তে সে পথেই ছুটতে থাকে। তারা মনে করে যে, তারা নিজেরা মোটেই চলছে না, যা ঘটছে তা সার্বিক সত্তাই করছে।

বস্তুত শেষোক্ত তিনটি মতাদর্শও প্রথমোল্লিখিত মতের ন্যায় জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ভাবধারায় ভরপুর। ফলে এ মতের অনুসারীদের সমগ্র জীবন জাহেলিয়াতের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। কারণ প্রথম কথা এই যে, এসব মতাদর্শের কোন একটিরও কোন বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, নিছক কল্পনা ও আন্দায-অনুমানের উপর একান্তভাবেই নির্ভর করেই বিভিন্ন প্রকার মত রচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এসব মতাদর্শ প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থার যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তা বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত হয়। এসবের মধ্যে একটি মতও যদি প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ হত তবে তদনুযায়ী কাজ করলে খারাপ ফল হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না। একটি জিনিস ভক্ষণ করলেই যখন নিশ্চিতরূপে মানুষের পেটে ব্যথার সৃষ্টি হতে দেখা যায় তখন আমরা সকলেই একথা নির্ভুল বলে বুঝতে পারি যে, পাকস্থলীর গঠন প্রকৃতি এবং এর হযম-শক্তির সাথে এই জিনিসটির বস্তুতই কোন সামঞ্জস্য নেই। অনুরূপভাবে শির্‌ক, বৈরাগ্যবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করলে সমগ্র মানবতা যখন নিশ্চিতরূপে বিপর্যস্ত ও সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—আর এ ব্যাপারে যখন আর কোন সন্দেহ নেই, তখন সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের কোন একটিও যে বাস্তব অবস্থা ও প্রকৃত সত্যের অনুরূপ নয়, তাতেও বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

এরপর তৃতীয় পন্থাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাব লাভ—বুনিয়াদি সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ উপায়। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ এসব প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার যে সমাধান দেখিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে তাই পূর্ণরূপে গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এ পন্থাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। কোন নতুন ও অপরিচিত স্থানে সর্বপ্রথম উপস্থিত হলে আর সেই স্থান সম্পর্কে নিজের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলে তখন অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস এবং তার পথনির্দেশ অনুসারে সে স্থান পরিভ্রমণ করাই হয় একমাত্র উপায়। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্থান সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতার দাবীদার ব্যক্তিকেই সর্বপ্রথম খুঁজে বের করতে হয়। এরূপ লোকের সাক্ষাত পেলে সে ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কিনা, নানাভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করে সে সম্পর্কে নিসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। তারপরই এই ব্যক্তির নেতৃত্বে পথ চলে দেখতে হয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন প্রমাণিত হয় যে, তার নিকট লব্ধ জ্ঞান তথ্য অনুসারে কাজ করে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হয়নি বা খারাপ ফল নির্গত হয়নি, তখনই এই ব্যক্তির নির্ভুল অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট স্থান সম্পর্কে তার উপস্থাপিত স্থান তথ্যের সততা সম্বন্ধে মনে আর কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ থাকে না। বস্তুত এই কর্মপন্থা মূলতই বৈজ্ঞানিক। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা যখন আর হতেই পারে না, তখন মত নির্ধারণের ব্যাপারে এটাকেই বিশুদ্ধ, নির্ভুল পন্থারূপে গ্রহণ করতে হয়।

এ উদাহরণ সম্মুখে রেখে মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাব লাভ করার সঠিক পন্থা নির্ণয় করা খুবই সহজ। মানুষের পক্ষে এ দুনিয়া অভিনব, অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব স্থান। এটার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং মৌলিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। এ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন্ ধরনের এবং কোন্ ধাঁচের, কোন্ আইন অনুযায়ী এ বিশ্ব-কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, এ পৃথিবীর বুকে মানুষের পক্ষে অনুকূল আচরণ নীতি কি হতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষ একেবারেই অনভিজ্ঞ। ফলে বাহ্যদৃষ্টিতে দুনিয়া সম্পর্কে যা কিছু ধারণা করা যায় তাই মানুষ ধারণা করে, তাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে এবং সে

অনুসারে যেরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করা কর্তব্য মনে হয় মানুষ তাই করে। কিন্তু এর বাস্তব ফল অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

এরপর মানুষ নিছক আন্দায-অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মত ঠিক করতে থাকে এবং প্রত্যেকটি মত অনুযায়ী কাজ করার পর তার তিক্ত ফল ভুগতে থাকে। এরপর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পন্থা এই থেকে যায় যে, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত নবীদের নিকট পথের সন্ধান জানতে চাইবে। নবীগণ নিজেদেরকে 'প্রকৃত সত্য নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞরূপে' পেশ করেন—তার দাবীও তাঁরা করে থাকেন। তাঁদের যাবতীয় অবস্থার যতই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায়, ততই তাঁরা অত্যন্ত সত্যবাদী, বিশ্বাসযোগ্য আমানতদার, সততাসম্পন্ন, সচ্চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ এবং নির্ভুল চিন্তার ধারক বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই শুরুতেই বিশ্বাস করার এবং তাদের প্রতি আস্থা স্থাপনের যুক্তিসংগত কারণ বর্তমান রয়েছে।

অতপর দুনিয়া সম্পর্কে এবং দুনিয়ায় মানুষের অবস্থান সম্পর্কে যেসব জ্ঞান-তথ্য তাঁরা পরিবেশন করেন, তাঁরা সত্যাসত্য, যৌক্তিকতার এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার সামঞ্জস্য পরীক্ষা করতে হবে। উপরন্তু তার বিরুদ্ধে কোন বাস্তব (কর্মগত) প্রমাণ আছে কিনা এবং তদনুযায়ী যে আচরণ নীতি দুনিয়ায় অবলম্বন করা হচ্ছে, বাস্তব পরীক্ষায় তা কিরূপে প্রমাণিত হল, তাও বাছাই করে দেখতে হবে। তদন্ত ও যাচাই-গবেষণার পর এ তিনটি কথারই উত্তর যদি নিসন্দেহ রূপে লাভ করা যায়, তাহলে নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য এবং তাঁদের পথনির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা আর এ মতাদর্শের সাথে বাস্তব সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য জীবনের কর্মক্ষেত্রের যেরূপ আচরণ ও কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত—তা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

পূর্বেই বলেছি, জাহেলিয়াতের পূর্বোক্ত পন্থাসমূহের মুকাবিলায় শেষোক্ত পন্থাটি নিসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। এই বিজ্ঞানের সম্মুখে মানুষ যদি নতি স্বীকার করে, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে যদি এটাকেই অনুসরণ করে এবং এই 'বিজ্ঞান' মানুষের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করেছে তা রক্ষা করেই যদি তারা জীবন যাপন করে, তবে এটাই হবে ইসলামী কর্মপন্থা।

মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে নবীদের মত

নবীগণ বলেন :

মানুষের চতুর্দিকে বিদ্যমান এই বিরাট বিশাল বিশ্বভূবন—মানুষ যার একটি অংশ—কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল নয়। এটা এক শৃঙ্খলাপূর্ণ সুসংঘবদ্ধ ও নিয়মতন্ত্র সম্মত সাম্রাজ্য বিশেষ। আল্লাহ তায়ালাই এটা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর মালিক, তিনিই এর একমাত্র শাসনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী। (সমগ্র সৃষ্টিজগত একটি সার্বিক ব্যবস্থার (Totalitarian System) অধীন) এখানকার সমগ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে নিবদ্ধ। সেই উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা ভিন্ন এই প্রাকৃতিক জগতে অন্য কারো বিধান চলে না। বিশ্ব ব্যবস্থার যত শক্তিই কর্মনিরত হয়ে আছে, তা সবই এক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধীন এবং অনুগত। তার বিধান ও নির্দেশের বিরোধিতা করা কিংবা তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা কারো নেই। এই সঠিক ব্যবস্থায় কোনরূপ স্বাধীনতার (Independence) ও দায়িত্বহীনতার (Irresponsibility) আদৌ অবকাশ নেই। আর স্বভাবতই তা থাকতে পারে না।

মানুষ এ জগতে জন্মগত প্রজা (Born Subject) হওয়া তার ইচ্ছা সাপেক্ষ নয় বরং প্রজা হিসেবেই তার জন্ম হয়েছে ; আর প্রজা ভিন্ন অন্য কিছু হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব নিজের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করা এবং নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করার কোন অধিকারই তার নেই।

মানুষ নিজে বিশ্ব ভূবনের কোন কিছুরই মালিক নয়। কাজেই মালিকানা ব্যবহারের পদ্ধতি তার রচনা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার নিজের শরীর, তার অন্তর্নিহিত সকল প্রকার ক্ষমতা-প্রতিভা একমাত্র আল্লাহর মালিকানা—আল্লাহরই অবদান মাত্র। কাজেই এসবের কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। যিনি মানুষকে এসব জিনিস দান করেছেন, তাঁরই মর্জী ও বিধান অনুযায়ী এর ব্যবহার করাই মানুষের কর্তব্য।

অনুরূপভাবে মানুষের চতুষ্পার্শে দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান রয়েছে—জমি, জন্তু, পানি, উদ্ভিদ, গাছপালা ও গুল্ম-লতা, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার মালিকানা, মানুষ এর মালিক নয়। কাজেই সে সবের উপরও নিজের ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করার

কোন অধিকারই মানুষের নেই। বরং প্রকৃত মালিক এসব ব্যবহার করার জন্য যে নিয়ম-বিধান রচনা করে দিয়েছেন তদনুযায়ী এটা ব্যয়-ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য।

দুনিয়ার বুকে যত মানুষ বসবাস করছে, তাদের জীবন পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। এরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার 'প্রজা'। অতএব এদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নিয়ম-নীতি নির্ধারণের কোন অধিকার এই মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী এসব কাজ অঞ্জাম দেয়া কর্তব্য। আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতেই তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আল্লাহর সেই বিধান কি? পয়গাম্বরগণ বলেন যে, যে জ্ঞান উৎস হতে আমরা দুনিয়ার এবং স্বয়ং মানুষের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেছি সেই সূত্র হতে আমরা আল্লাহর বিধানও পেয়েছি, আল্লাহ নিজেই আমাদের এই জ্ঞান দান করেছেন এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকেও এ দিক দিয়ে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ও অবহিত করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। অতএব আমাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদেরকে মহামহিমান্বিত 'বাদশাহের' প্রতিনিধি মনে করা এবং আমাদের নিকট হতে আল্লাহর প্রামাণ্য বিধান গ্রহণ করাই মানুষের কর্তব্য।

পয়গাম্বরগণ আরও বলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সমগ্র কাজ সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে দেখা যায় বটে কিন্তু কোথাও কোন পরিচালক পরিদৃষ্ট হয় না, তার কর্মচারী কোনখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে মানুষ এখানে এক প্রকারের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের অবকাশ অনুভব করে, মানুষ এখানে 'মালিকের' ন্যায় আচরণ করতে পারে। প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপরের সম্মুখে দাসত্ব ও আনুগত্যের অনুভূতিতে মাথাও নত করতে পারে, আর সকল অবস্থায়ই তার 'রিযক'—জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অব্যাহতভাবে লাভ করতে সক্ষম হয়। সকল প্রকার কাজের সুবিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহিতার প্রতিফল সংগে সংগে পায় না। মূলত এসব মানুষের পরীক্ষার জন্য করা হয়েছে। মানুষকে যেহেতু জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক, উদ্ভাবন ও নির্বাচন শক্তি দান করা হয়েছে, এ কারণেই প্রকৃত 'মালিক' 'রাজাধিরাজ' নিজেকে এবং নিজের অদৃশ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার কিভাবে করে তার পরীক্ষা ও যাচাই করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আল্লাহ

মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, নির্বাচন স্বাধীনতা (Freedom of Choice) এবং এক প্রকারের 'স্বরাজ' (Autonomy) দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি তার জন্মগত প্রজা হওয়ার কথা হৃদয়ংগম করে এবং সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় এ মর্যাদা কেই গ্রহণ করে—এ মর্যাদা গ্রহণের জন্য কোন দিক দিয়াই কোনরূপ যবরদস্তি না হওয়া সত্ত্বেও ; তবেই মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার এ পরীক্ষায় সফলকাম হতে পারবে। পক্ষান্তরে প্রজা হওয়ার মর্যাদা যদি মানুষ বুঝতে না পারে কিংবা বুঝতে পেরেও বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তবে পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য। অথচ এ পরীক্ষার জন্যই মানুষকে দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। দুনিয়ায় অসংখ্য জিনিসই মানুষের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। আর সেই সংগে একটি জীবন ব্যাপী সময় তাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

অতপর পয়গাম্বরগণ এও বলেছেন যে, পার্থিব জীবন যেহেতু একটানা ও নিরবচ্ছিন্ন একটি পরীক্ষার মুহূর্ত, কাজেই কাজ কর্মের প্রকৃত হিসেব এই দুনিয়ায় হবে না, কোন প্রতিফল—শাস্তি বা সম্মানও—এখানে লাভ হবে না।[১]

মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু 'ভাল' লাভ করে তা যে কোন পুণ্যের প্রতিফলই হবে এমন কোন কথা নেই। তা মানুষের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণও নয়। কিংবা মানুষ যা কিছু করেছে তার নির্ভুল হওয়ারও কোন লক্ষণ নয়। মূলত তা পরীক্ষার সরঞ্জাম বিশেষ—ধন-সম্পদ, সন্তান-প্রজনন

১. এ সম্পর্কে একটি কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াতে আমরা এখন বসবাস করছি, মূলত এটা প্রাকৃতিক জগত (Physical World)—নৈতিক বিধানভিত্তিক জগত এটা নয়। বিশ্বজগতের বর্তমান ব্যবস্থা যেসব আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত তাও নৈতিক নিয়ম নয়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম। এ জন্য বর্তমান পার্থিব ব্যবস্থায় মানুষের কাজ-কর্মের নৈতিক ফল পুরাপুরিভাবে লব্ধ হতে পারে না। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়ম যতখানি এই ফল নির্গমের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করবে, ঠিক ততখানিই নৈতিক ফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম যদি সেই সুযোগ না দেয়, তবে তা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। যেমন, নরহত্যার নৈতিক ফল প্রকাশ তখনি হতে পারে, যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হত্যাকারীর সন্ধান করতে, তার অপরাধ প্রমাণে এবং তার উপর হত্যার নৈতিক দণ্ড কার্যকরী করার ব্যাপারে সাহায্য করে। নতুবা কোন নৈতিক 'ফল' আদৌ প্রকাশিত হতে পারবে না। তার আনুকূল্য লাভ হলেও এ কাজের পুরাপুরি নৈতিক ফল কখনও প্রকাশিত হবে না। কারণ নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে শুধু প্রাণদণ্ড দেয়াই তার এ কাজের পূর্ণ নৈতিক ফল নয়। এ জন্যই বর্তমান পৃথিবী প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র নয়—তা হতেও পারে না। প্রতিফল দানের ক্ষেত্র হবার জন্য এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থার একান্ত আবশ্যক যেখানে বর্তমান প্রচলিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নৈতিক নিয়মই হবে প্রধান ও প্রভাবশীল। আর প্রাকৃতিক আইন হবে তার আজ্ঞাবাহক ও অনুকূল অবস্থার উদ্ভাবক মাত্র।

শক্তি, রাষ্ট্র ও সরকার, জীবন যাপনের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী সবকিছুই শুধু পরীক্ষার জন্য মানুষকে দান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এসব প্রয়োগ ও ব্যবহার করে নিজেদের ভাল কিংবা মন্দ কর্মক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করবে। অনুরূপভাবে দুঃখ-কষ্টে, ক্ষতি-আঘাতে, মানুষের বর্তমান জীবনে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাও কোন পাপ কাজের শাস্তি নয়। তন্মধ্যে অনেকগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়।[১] উহাদের কতকগুলো নিছক পরীক্ষা স্বরূপ।[২] আর কতকগুলো হয় প্রকৃত অবস্থার বিপরীত মত নির্ধারণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ—অনিবার্যভাবে।[৩]

মোটকথা এ দুনিয়া মোটেই 'প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র' নয়। মূলত এটা পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে প্রকাশিত কর্মফল দ্বারা কোন্ পন্থার বা কোন কাজের বিশুদ্ধ, নির্ভুল বা ভ্রান্ত কিংবা পাপ অথবা পুণ্য—গ্রহণযোগ্য বা বর্জনযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। এজন্য তা কোন মানদণ্ড হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে না। সে জন্য প্রকৃত, নির্ভুল ও একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে পারলৌকিক ফলাফল। পৃথিবীর এই অবকাশের মুহূর্ত—এ পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পর আর একটি জীবন রয়েছে। তখন পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে যাচাই করা হবে, আর এ পরীক্ষায় কে সাফল্য লাভ করল, কে ব্যর্থকাম হল, তার চূড়ান্ত ফায়সালা তখনি করা হবে। পারলৌকিক জীবনের সাফল্য-অসাফল্য কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথম এই যে, মানুষ নিজের দৃষ্টি ও যুক্তিবিন্যাস প্রতিভার নির্ভুল প্রয়োগের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত ও একমাত্র ব্যবস্থাপক, আইন রচয়িতা এবং তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জীবন বিধানকে যথার্থ আল্লাহর বিধান বলে জানতে পারল কিনা। দ্বিতীয় এই নিগূঢ় সত্য জেনে নেয়ার পর পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে আল্লাহ তায়ালার বাস্তব প্রভুত্ব এবং তাঁর শরীয়াতী বিধানের সম্মুখে মাথা নত করল কিনা।

---

১. যেমন ব্যভিচারীর রোগাক্রান্ত হওয়া—এটা তার এ পাপের নৈতিক শাস্তি নয়। এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ফলমাত্র। চিকিৎসায় সাফল্য লাভ হলে রোগ হতে সে মুক্তি পাবে বটে ; কিন্তু নৈতিক শাস্তি হতে কখনই রক্ষা পাবে না। আর 'তওবা' করলে নৈতিক শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলেও কেবল এটার দরুনই রোগ হতে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না।

২. যেমন কারো দরিদ্র হওয়া। এ সময় সে তার প্রয়োজন মিটাবার জন্য অসংগত পন্থা অবলম্বন করে না—ন্যায়সংগত পথেই দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, বিপদের কঠিন আঘাতে সত্য ও সততার পথে মযবুত থাকে, না অস্থির হয়ে অন্যায় ও পাপ পথে পদক্ষেপ করে—এসব দিক দিয়ে তার পরীক্ষা হয়।

৩. মানুষ যখন এ দুনিয়াকে 'রব' হীন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' মনে করতে শুরু করে কিন্তু যেহেতু এটা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত—সেহেতু এই দুনিয়া 'রব' হীন নয়—মানুষও এখানে স্বাধীন নয় ; তাই প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত কাজ করার ফলে আঘাত খাওয়া অনিবার্য। আগুনকে খেলনা মনে করে স্পর্শ করলে হাত পুড়ে যাবে কারণ এ আচরণ স্বাভাবিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলামী মতবাদ

মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে নবীদের উপস্থাপিত এ মতাদর্শ একটি পরিপূর্ণ মতবাদ। এর সমগ্র দিক ও বিভাগ পরস্পর জড়িত—পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসম্মত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এর একটি অংশ অপরটির বিপরীত বা বিরোধী নয়। এর ভিত্তিতে বিশ্বের সকল প্রকার ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান অত্যন্ত সহজ। এ মতের বিশ্লেষণ করা যায় না। এমন কোন জিনিসই কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। অতএব এটা একটি বৈজ্ঞানিক মত (Scientific Theory) এবং এর যে সংজ্ঞাই দেয়া হোক না কেন, এ মত সম্পর্কে তা নিসন্দেহে প্রযোজ্য হবে।

পরন্তু কোন গবেষণা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ বা বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ মতকে আজ পর্যন্ত 'ভ্রান্ত' প্রমাণ করতে পারেনি। বস্তুত এটা বাস্তবে পরিণত সত্য, এর সত্যতা চিরস্থায়ী। প্রমাণিত ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে এটাকে কোন মতেই গণ্য করা যায় না।[১] বিশ্বপ্রকৃতির যে নিয়ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে দিক দিয়েও এ মত খুবই সত্য বলে মনে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরাট ও ব্যাপক নিয়ম-শৃংখলা এবং এর সুসংবদ্ধতা দেখে স্বতই মনে হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মনে হবে যে, নিশ্চয়ই এর কোন 'ব্যবস্থাপক' রয়েছেন ; এরূপ মনে না করার মূলে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে এ সুসংবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলা এটাকে একটি 'কেন্দ্র ভিত্তিক ব্যবস্থা' এবং এই ব্যবস্তায় একজন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধিকারী পরিচালক থাকার জন্য বিশ্বাস করাই বুদ্ধিসম্মত মনে হয়, এটাকে বিকেন্দ্রীক মনে করা এবং এর অসংখ্য পরিচালকের অধীন চলার কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বপ্রকৃতির এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, যৌক্তিকতা এবং নির্ভুল বুদ্ধির যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে এটাকে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা মনে করাই অধিকতর যুক্তিসংগ, এটাকে উদ্দেশ্যহীন এবং শিশুর খেলনা মনে করার মূলে কোনই যুক্তি থাকতে পারে না।

---

১. কোন বিশেষ যুগের বৈজ্ঞানিক মত এর বিপরীত হলেই এর ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় না। বৈজ্ঞানিক মতে বাস্তব সত্যই (Facts) এটাকে চূর্ণ করতে পারে—নিছক মতবাদ নয়। অতএব মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে নবীদের উপস্থাপিত ধারণাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বাস্তব ও সপ্রমাণিত ঘটনাই ভুল প্রমাণিত করবে ততক্ষণ এটাকে 'অতীত কালের মতবাদসমূহের' মধ্যে গণ্য করা শুধু মারাত্মক ভুল ও অবৈজ্ঞানিকতাই নয়, তা হিংসা-বিদ্বেষমূলক কাজের পরিণামও বটে।

এতদ্ব্যতীত এ বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থাকে আমরা যদি একটি বাস্তব রাজ্য এবং মানুষকে এই বিরাট ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার একটি অংশ বলে মনে করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, এই নিয়ম-শৃংখলা ব্যবস্থার অধীন মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার ও স্বাধীনতার কোনই অবকাশ থাকতে পারে না। এই পৃথিবীতে প্রজা হওয়াই মানুষের সঠিক মর্যাদা। এ দিক দিয়েও উল্লিখিত মতটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত (Most Reasonable) বলে মনে হয়।

বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার করলেও এটা একটি বাস্তব কর্মোপযোগী (Practicable) মত বলেই প্রতিপন্ন হয়। এ মতের ভিত্তিতে মানব জীবনের একটি পূর্ণাংগ ও ব্যাপক কর্মসূচী এর খুঁটিনাটিসহ খুব সহজেই রচিত হতে পারে। দর্শন, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ-সন্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ—এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল প্রয়োজন ও সমস্যার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ব্যবস্থা এরই ভিত্তিতে লাভ করা সম্ভব। ফলে মানব জীবনের কোন বিভাগেই কর্মনীতি নির্ধারণের জন্য এ মতাদর্শের বাইরে যাওয়ার কোন দিনই প্রয়োজন দেখা দেবে না।

পক্ষান্তরে, এ মতাদর্শের ভিত্তিতে মানুষের এ পার্থিব জীবন কিরূপে গঠিত হয় এবং এর ফলাফলই বা কিরূপ এখন তাই আমাদের বিচার্য। এ মতবাদ—ব্যক্তিগত জীবনকে অন্যান্য জাহেলী মতবাদসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত—অতীত দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন এবং খুবই সুসংবদ্ধ ও শৃংখলাপূর্ণ (Well Diciplined) করে তোলে। এ মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ এই যে, মানুষ তার দেহ তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ—এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর কোন একটি বস্তুকেও নিজের মালিকানা সম্পদ মনে করে তার সাথে স্বাধীনভাবে আচরণ করবে না, বরং আল্লাহর মালিকানা মনে করে তাঁরই আইন ও বিধানের ভিত্তিতে এর ব্যবহার করবে। তার লব্ধ প্রত্যেকটি জিনিসকেই আল্লাহর আমানত মনে করবে এবং এ আমানতের হিসেব তাঁর নিকট দিতে হবে যার নিকট কোন কাজ, মনের কোন গোপন ইচ্ছাও অজ্ঞাত নয় এবং একথা মনে করেই এটাকে ব্যবহারে আনবে। এরূপ সচেতন মানুষ যে সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই একটি আদর্শের নিষ্ঠাবান অনুসারী হবে তাতে সন্দেহ নেই। এরূপ ব্যক্তি কখনই লজ্জাহারা ও প্রবৃত্তির দাস হতে পারে না। অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। এমন ব্যক্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সম্ভব। শৃংখলা রক্ষা ও নিয়মতন্ত্র অনুসরণের ব্যাপারে কোন বাহ্যিক

চাপের (Pressure) প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করবে না। সেজন্য একটি বিরাট শক্তি সম্পন্ন নৈতিক বাঁধন ও সংযম অনুভূতি জেগে উঠে। ফলে, যেসব অবস্থায় কোন পার্থিব শক্তির নিকট জবাবদিহি করার কোনই আতংক থাকে না, তখনও এ শক্তি তাকে সততা, ন্যায় ও সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। বস্তুত সমাজের লোকদের সর্বধিক বিশ্বাসভাজন করে তুলার জন্য আল্লাহর ভয় ও আমানতদারীর অনুভূতি অপেক্ষা উত্তম ও কার্যকরী উপায় অন্য কিছু হতে পারে না।

অধিকন্তু এ মত মানুষকে কেবল সংগ্রামী ও অবিশ্রান্ত চেষ্টানুবর্তী করে তোলে না ; এর যাবতীয় চেষ্টা-সাধনাকে স্বার্থপরতা, আত্মপূজা অথবা জাতিপূজার পংকিলতা হতে পবিত্র করে সততা ও সত্যবাদিতা এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য পথে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এ দুনিয়ায় তার আগমন উদ্দেশ্যহীন নয়, কোন বিরাট কাজ সম্পাদনের জন্যই এখানে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তার জীবন কেবল নিজের জন্যই কিংবা তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্যই নয় বরং তার জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তোষমূলক কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাকে বিনা হিসেবে রেহাই দেয়া হবে না, তার সময় ও ক্ষমতার কতখানি কোন্ কাজে ব্যয় হয়েছে তার হিসেব নেয়া হবে।—একথা যার মনে সতত জাগ্রত থাকবে, তার তুলনায় অধিক পরিশ্রমী ফলপ্রসু, সুষ্ঠু ও নির্ভুল চেষ্টানুবর্তী ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। কাজেই এ মতাদর্শ যতদূর উত্তম ও আদর্শ ব্যক্তি গঠন করে, তদপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি চরিত্রের ধারণা করা যায় না।

সামগ্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এর পরীক্ষা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জ্যক। সর্বপ্রথম কথা এই যে, মতাদর্শ মানব সমাজের ভিত্তিমূলকেই সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেয়। এ মত অনুযায়ী সমগ্র মানুষ আল্লাহর প্রজা—এবং এ দুনিয়ার ক্ষেত্রে সকলের মর্যাদা, সকলের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা সকলের পক্ষেই সমান। কোন ব্যক্তি কোন পরিবার কোন শ্রেণী, কোন জাতি, কোন বংশের জন্য অন্যান্য মানুষের উপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য নেই—নেই কোন বৈষম্যমূলক অধিকার। এভাবে মানুষের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মূলোচ্ছেদ করা হয়। এবং রাজতন্ত্র, জায়গীরদারী, সামন্তবাদ, অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), ব্যাক্ষণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র প্রভৃতি জাহেলী মতাদর্শ হতে যেসব মারাত্মক দোষত্রুটি ও ব্যধি সৃষ্টি হয়—ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করলে তারা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

এটা বংশীয়, গোত্রীয়, ভৌগলিক, আঞ্চলিক এবং বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য বিদ্বেষেরও মূলোৎপাটন করে। কারণ এসব মারাত্মক ব্যধিই মানব সমাজে আবহমানকাল যাবত রক্তপাত ও যুদ্ধ সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইসলামী মতাদর্শের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সমগ্র মানুষ এক আদমের সন্তান এবং আল্লাহর বান্দাহ। এ সমাজে গোত্র, ধন-সম্পত্তি কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় না ; নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় থাকা না থাকার ভিত্তিতে এ পার্থক্য হতে প্যারে। আল্লাহভীতি যার মধ্যে সর্বাধিক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যের জন্য সংগ্রামশীলতার দিক দিয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবেন। ইসলামী সমাজে কেবল তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হবে।

এরূপে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধ কিংবা পার্থক্য বৈষম্যের ভিত্তি ও দৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। সমাজক্ষেত্রে মিলন বিচ্ছেদের যে মান বা কারণ মানুষ নিজেরা আবিষ্কার করেছে তা বিশ্ব মানবতাকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে ; এ খণ্ডসমূহের মধ্যে দুর্লংঘ্য প্রাচীরও খাড়া করে দেয়। যেহেতু বংশ, স্বদেশ, জাতীয়তা কিংবা বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন করা মানুষের সাধ্যাতীত—এদের মধ্যে একটির অন্তর্ভুক্ত মানুষ কোনক্রমেই অন্যটির মধ্যে গণ্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামী মতাদর্শে মানুষের মধ্যে মিলন বিচ্ছেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে—আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর বিধান পালনের উপরে। কাজেই সৃষ্টির দাসত্ব পরিত্যাগ করে যারা স্রষ্টার বন্দেগী শুরু করবে এবং মানুষের রচিত আইনে পদাঘাত করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা সকলেই একটি জামায়াতের মধ্যে গণ্য হবে। আর যারা এরূপ করবে না তারা ভিন্ন দলভুক্ত হবে এভাবে মানব সমাজের সকল প্রকার পার্থক্য-বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র পার্থক্যই থেকে যায় আর এই পার্থক্য সকলেই লংঘন করতে পারে। কারণ আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন যাপনের রীতিনীতি পরিবর্তন করে একটি দল হতে অপর দলের মধ্যে শামিল হওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই সহজ।

এসব সংশোধন-সংস্কারের পর মতাদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠে, তার মনোবৃত্তি মানসিকতা ভাবধারা ও সমাজের গঠন অবয়ব (Social Structure) আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর রাষ্ট্র মানব প্রভুত্বের ভিত্তিতে নয়—আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের বুনিয়াদেই স্থাপিত হয়।[১] এখানে প্রকৃতপক্ষে

১. গ্রন্থকার রচিত 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' দ্রষ্টব্য।

আল্লাহরই শাসন কায়েম হয়, আল্লাহরই আইন জারী এবং কার্যকরী হয়। মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করতে থাকে। এর ফলে প্রথমত মানুষের হুকুমাত এবং মানুষের আইন রচনার অধিকারজনিত সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিমিষেই দূর হয়। দ্বিতীয়ত, এ মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার ফলে আর একটি বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তা এই যে, রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থাই ইবাদাত ও তাকওয়ার পূত ভাবধারায় পরিপ্লুত হয়। রাষ্ট্রনেতা ও জনগণ সকলেই সমানভাবে অনুভব করতে থাকে যে, তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীন জীবন যাপন করছে এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত আল্লাহর সংগেই তাদের প্রত্যেকটি ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। করদাতা আল্লাহকেই কর দিচ্ছে মনে করে তা আদায় করে এবং তার গ্রহণকারী ও খরচকারী উভয়েই নিজেদেরকে এর আমানতদার মাত্র মনে করে। একজন সিপাহী হতে বিচারপতি ও গভর্নর পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীই ঠিক সেই মানসিকতার সাথে কর্তব্য পালন করে, যেরূপ মনোভাব নিয়ে তারা সালাত আদায় করে ; তাদের পক্ষে এই উভয় প্রকার কাজ সমানভাবে ইবাদাত এবং উভয় ক্ষেত্রে একই প্রকার আল্লাহভীরুতা এবং সে জন্য শংকাপূর্ণ মনোভাবের প্রয়োজন। গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে সন্ধান করা হয় আল্লাহর ভয়, আমানতদারী, বিশ্বাস পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী। এর পরিণামে সমাজের সর্বাধিক উন্নতি ও উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই নেতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন—রাষ্ট্রে ক্ষমতা তাদেরই হাতে অর্পণ করা হয়।

সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ মতাদর্শ অনুরূপ আল্লাভীরুতা ও নৈতিক পবিত্রতার স্বতস্ফূর্ত ভাবাধারা প্রবাহিত হয়। আত্মপূজার পরিবর্তে আল্লানুগত্যের প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে এক আল্লাহর সম্পর্কই ভিত্তিগত মর্যাদা লাভ করে, আল্লাহর আইনই পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলাপূর্ণ করে। এই আইন যেহেতু সেই মহান সত্তাই রচনা করেছেন, যিনি সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও নফসের খাহেশের পংকিলতা হতে পবিত্র, সর্বজ্ঞ, পরম বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিমান, তাই তাঁর রচিত আইনে অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতা যুলুম-পীড়ন ও ভাঙন-বিপর্যয়মূলক কোন ব্যবস্থাই বিন্দুমাত্র স্থান পায়নি। উপরন্তু মানব প্রকৃতির সকল দিক এবং মানুষের সকল জৈবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা রচিত হয়েছে।

এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বিরাট সমাজ ও সামগ্রিক জীবন গড়ে উঠে, [illegible] তার পূর্ণ চিত্র পেশ সম্ভব নয়। কিন্তু উপরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা

দ্বারা মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে পয়গম্বরদের উপস্থাপিত ধারণার ভিত্তিতেই যে ধরনের জীবনধারা গঠিত হয় এবং বাস্তব ফলাফল প্রকাশিত হয় বা হতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা পাঠকের পক্ষে সহজ হবে বলে মনে করি। উপরন্তু এটা কেবলমাত্র অসম্ভব কল্পনার সুখরাজ্য (Utopia) নয়। বিশ্ব ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এ মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি সমাজ, একটি সমষ্টিগত জীবন একটি উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে বিশ্বমানবের সম্মুখে তার বাস্তবতার স্পষ্ট নিদর্শন স্থাপন করা হয়েছে। আর ইতিহাসও এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তিদের তুলনায় উত্তম লোক মানব সমাজে আর কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি এবং এর ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্র অপেক্ষা কোন রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি। এ রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল (প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক বেদুঈন নারী ব্যভিচারের দরুন অন্তসত্তা হয়েছিল ; ইসলামী শরীয়াতে এ পাপের দণ্ড যে সংগেসার—প্রস্তর খণ্ডের আঘাত দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দান—এর ন্যায় ভয়াবহ তা সে ভাল করেই জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেই হযরত (সা)-এর দরবারে হাযির হয় এবং অপরাধের দণ্ড দানের জন্য অনুরোধ করে। তাকে সন্তান প্রসবের পরে আসার জন্য বলে দেয়া হয় এবং কোন মুচলেকা বা জামানত ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। পরে সন্তান প্রসবের পর সে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্য দাবী জানায়। কিন্তু এবারেও তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সন্তানকে স্তনদান ও লালন পালন করার পর পুনরায় আসার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে আবার সে মরুভূমির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু কোন পুলিশ পাহারার প্রয়োজন বোধ হয়নি। স্তন দানের নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার পর মরুবাসিনী আবার ফিরে আসে এবং কৃত অপরাধের দণ্ডদানে তাকে পবিত্র করে দেবার প্রার্থনা জানায়। অতপর তাকে 'সংগেসার'—পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এভাবে যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন তার জন্য আল্লাহর নিকট 'রহমতের দোয়া করা হয়'। এ সময় এক ব্যক্তি সহসা বলে উঠে—মেয়েলোকটি বড় নির্লজ্জ ছিল।' তখন উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন, "আল্লাহর শপথ ! এই নারী যেভাবে তওবা করেছে, অনুরূপ তওবা যদি সকল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিই করত, তবে তাদেরকেও ক্ষমা করা হত।")

বস্তুত ইসলামী সমাজে নাগরিকদের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। আর রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য ছিল আরও বিরাট। কোটি কোটি টাকার আয় সম্পন্ন এবং

ইরান, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বিপুল ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রাজ্যের বায়তুলমালের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার রাষ্ট্রপ্রধান মাসিক বেতন স্বরূপ মাত্র দেড়শত টাকা গ্রহণ করতেন ; আর নাগরিকদের মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণের যোগ্য একজন লোক খুঁজেও পাওয়া যেত না।

এই বিরাট বাস্তব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভের পরেও যদি নবীদের স্থাপিত বিশ্ব-ব্যবস্থার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তাতে মানুষের অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কীয় মতাদর্শের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে এ বিষয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করার অন্য কোন উপায় নেই। কারণ আল্লাহ ফিরিশতা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এ দুনিয়ায় কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর যেখানে তা সম্ভব নয় তথায় বিভিন্ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন সত্যাসত্য নির্ধারণে অন্য মানদণ্ড আদৌ হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রোগীর দেহাভ্যন্তরের কোথায় কোন জটিল ও দূরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে শত চেষ্টা করেও যদি তার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব না হয় তাহলে চিকিৎসক বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন এবং যে ঔষধটি এ অজ্ঞাত রোগ নির্ধারণে সাহায্য করে তাই রোগের প্রকৃত ঔষধ বলে বিবেচিত হয়। ঐ ঔষধে রোগ দূর হওয়ার ফলে নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় ঐ ঔষধে দেহাভ্যন্তরস্থ রোগ চিকিৎসার সম্পূর্ণ অনুকূল—ইহা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে মানব জীবনের জটিল যন্ত্র অন্য কোন মতাদর্শ অনুযায়ী যখন সঠিকভাবে চলতে পারে না। পক্ষান্তরে কেবল নবীদের উপস্থাপিত মতের ভিত্তিতেই যখন তা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, তখন এটাই—এ মতাদর্শই প্রকৃত অবস্থার অনুকূল হওয়ার জন্য অনস্বীকার্য প্রমাণ। বস্তুত এই নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহ তায়ালার একটি রাজ্য। এ জীবনের পর আরো একটি জীবন বাস্তবিকই রয়েছে এবং সেই পারলৌকিক জীবনে সমস্ত মানুষকেই ইহ-জীবনের সকল কাজ-কর্মেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব দিতে হবে—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।